আছে তারই প্রতিস্পর্ধী অন্যতর ইচ্ছা? সেই ইচ্ছাই কী প্রতিবাদী সাহিত্যে চিত্রিত হয়? এই সমস্ত জটিল প্রশ্নমালার সামনে দাঁড়িয়েই আমার আলোচনার বিষয় 'বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদ : বিবর্তনের গতিমুখ'।

আমরা একথা মনে রাখব যে প্রতিবাদের কোনো কালসীমা নেই, যুগবিভাগ নেই। মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকদের মূলত 'Non conformist' হওয়া আমাদের কাছে যেন চেনা ছবি। আমাদের মনে পড়ে, আলব্যেয়ার কামু-র 'রেবেল'-এর কথা বা এমিল জোলা-র 'জাঁএক্সকিউজ' এর কথা। 'আন্তেগোনে' বা 'প্রমিথিউস' আমাদের প্রতিবাদী সত্তার যাত্রাপথের অগ্রপথিক হিসাবে আজও আমাদের আলোড়িত করে। আমাদের মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এ 'সীতার পাতাল প্রবেশ' এক মহাঅন্যায়ের বিরুদ্ধে যেন প্রবল প্রতিবাদ বা মহাভারতের দ্রৌপদী-র প্রতিশোধ স্পৃহা এক অন্যতর প্রতিবাদে একীভূত হয়ে যায়। আমরা মনে করতে পারি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ তৎকালীন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধারাপথেই 'চর্যাপদ' থেকে লহনা বা চাঁদসদাগরের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকের নবজাগরণ 'ফিউডাল এস্টাবলিশমেন্ট' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপেই প্রতিষ্ঠা পেল। 'নবজাগরণ' থেকে প্রাপ্ত মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীমুক্তিভাবনা, স্বাধীনতাস্পৃহা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর পাতায় পাতায়। 'নবজাগরণ' এর ফলেই গঠিত হয়েছিল আধুনিক বাঙালি মানস ও তার সাহিত্যচেতনা। রামমোহন, ডিরোজিও-দের আপোষহীন প্রতিবাদী আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালি মনীষা শিল্পসাহিত্যে দেবতার স্তুতির বদলে মানবিকমূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিল। আবার স্বাদেশিকতাকে অবলম্বন করে প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশিত হতে চেয়েছে বঙ্কিম-দীনবন্ধু-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায়। বাঙালির চিরকালের অহঙ্কার রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সামাজিক রক্ষণশীল কুপ্রথার বিরুদ্ধে, জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারিতের ওপর পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শাশ্বত হয়ে আছে। ব্যক্তিজীবনে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড বা হিজলী জেলে গুলিবর্ষণ বা চিনের ওপর জাপানের বোমাবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনায় আমরা যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী উচ্চারণ শুনেছি,—ঠিক তেমনই 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে' তার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমান উচ্চকণ্ঠ। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশ্রিত করার প্রবণতা যে দেশের পক্ষে কত ভয়ঙ্কর তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। তাই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অক্লেশে তাঁর উচ্চারণ, "ধর্মের ধুয়ো, দেশের ধুয়ো দুটোকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি" অথবা 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অতীনের সোচ্চার অনুভবে শুনি, "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীশুদ্ধ ন্যাশানালিস্ট পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে উঠেছে"। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মহাঅতীত থেকে সুবিশাল ভবিষ্যত পর্যন্ত পরিব্যপ্ত যাত্রার অখণ্ড মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়। একারণেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর সময়ের ক্ষত-বিক্ষত চৈতন্য, দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ বারে বারে ধরা পড়ে।

সামাজিক প্রশ্নে, রাজনীতির প্রশ্নে, ধর্ম ও ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্নে, রাষ্ট্রীয় সংকটের প্রশ্নে, সভ্যতার সংকটের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ যেমন ছিল আপোষহীন, তেমনই তাৎক্ষণিক সুবিধা বা তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একনিষ্ঠভাবে অবিশ্বাসী ও বিরোধী। এমন প্রতিবাদী সত্তার উদাহরণ রূপে তাঁর অজস্র রচনার উল্লেখ আমরা করতেই পারি। তবু বিশেষভাবে 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'গোরা', 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট' আজও আমাদের প্রতিবাদী চেতনায় প্রণোদনার কারণ হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ছিন্ন ক'রে বিদ্রোহী সুরে নতুন ভাবে সমাজদ্রোহের ভাষ্য রচনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম, "লাথি মার ভাঙ্‌রে তালা / যতসব বন্দীশালা / আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি" অথবা "ক্ষুধাতুর শিশু চায়নাক স্বরাজ / চায় দুটো ভাত, একটু নুন / বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা / কচি পেটে তার জ্বলে আগুন" অথবা "যে দধীচির হাড় দিয়ে আজ বাষ্প শকট চলে / বাবুরা এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।" আবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রতিবাদী উচ্চারণে আছে এক গভীর নাস্তিক্যবোধ ও বিশ্বাসভাঙা হৃদয়ের উত্তাপ, "সত্যদুখের আগুনে, বন্ধু, পরাণ যখন জ্বলে / তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে"। নজরুল-যতীন সেনগুপ্তের ধারাপথেই বাংলা কবিতায় প্রতিবাদী উচ্চারণ প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন দত্ত, দিনেশ দাস প্রমুখদের রচনায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে একেবারে স্বঘোষিত উচ্চারণে 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই' তাদের মুখপাত্ররূপে আমাদের কাছে হাজির হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদের যে গতিমুখ আমরা লক্ষ্য করেছি তা ব্যক্তিগতভাবে, একক প্রতিবাদী সত্তার চিত্র হিসেবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ বিভিন্ন সাহিত্যিক নিজের মতো নিজস্ব চিরন্তন-লালিত প্রতিবাদকে সংশ্লিষ্ট রচনায় বাঙ্ময় ক'রে তুলতে চেয়েছেন। আমরা কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবাদের উত্থান, চোখের সামনে সাহিত্যিক সোমেন চন্দ-এর মৃত্যু, অক্টোবর বিপ্লব, কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্রতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছিল 'সংগঠিত' প্রতিবাদের ভিত্তিভূমি। তারই ফলে প্রস্তুত হয়েছিল 'প্রগতি লেখক সংঘ'। 'প্রগতি লেখক সংঘ'কে কেন্দ্র করে শুরু হল প্রতিবাদের অন্যতর অভিমুখ। ১৯৩৬ এর শেষদিকে 'Towards Progressive Literature' নামক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন দত্ত, সাজ্জাদ জাহীর, মামুদ জাফর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এই সংঘে যোগ দেন গোপাল হালদার। আমরা যেন তারই ফলশ্রুতিতে পেলাম মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙরহীন নৌকা' ও 'পলিমাটির ফসল', গোপাল হালদারের 'একদা'। ১৯৩৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলন থেকে প্রস্তাব নেওয়া হল, "সনাতন সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার

আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ...সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌনস্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে, তার অপসারণের জন্যে লেখকদের সচেতন থাকতে হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফ্যাসিবিরোধী প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ও রোমারোঁলার কণ্ঠস্বরে যুক্ত হয়েছিল প্রগতিলেখক সংঘের কণ্ঠস্বর। 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য / ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা' এই উচ্চারণে প্রতিবাদ অন্য মাত্রা লাভ করল। আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সংগঠিতভাবে শিল্পসাহিত্যে প্রতিবাদকে সবচাইতে দৃঢ়, বাঙ্ময় রূপ দান করেছিল গণনাট্য আন্দোলন। বাংলা নাটক 'দর্পণ' শ্রেণির নাটকগুলির মধ্যে, বিশেষত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক ও উপেন দাসের 'গজনানন্দ ও যুবরাজ' এর মঞ্চায়ন বাংলামঞ্চে প্রতিবাদকে উপস্থিত করেছিল। তবু গণনাট্য আন্দোলন যে সার্বিক সংগঠিত প্রতিবাদকে বাংলা শিল্প-সাহিত্যে উচ্চকিত করেছিল তার প্রেক্ষিতটি কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৫-এ এখানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৩৪-এ কৃষকসভার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশবাসী প্রতিবাদী সাম্যচিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করেছিল। 'গণবাণী', 'লাঙ্গল' ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে সেদিন বাণীরূপ লাভ করেছিল বিপ্লবী সাম্যবাদী ভাবনার স্বতোৎসারিত আলাপন। এহেন আন্দোলন ও আলোড়নে যুক্ত হয়ে ১৯৩৭-এ যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংস্থার সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৮ এ 'জাপানকে রুখতে হবে' নামক নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নান্দীপাঠ করেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বজ্রকণ্ঠে তোলা আওয়াজ' এর সুরে সেদিন বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়েছিল। ১৯৪০ এর আগস্টে ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে কলকাতার Y.M.C.A হলে মঞ্চস্থ হল সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'কেরানী'। ঐ একই বছরে ওভারটুন হলে মঞ্চস্থ হল সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'অঞ্জন গড়' (মূল কাহিনী সুবোধ ঘোষের 'ফসিল')। এই সবেরই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ এর ২৫ মে বোম্বাইয়ের মাড়োয়ারি বিদ্যালয় মঞ্চে এবং পার্লের দামোদর হলে সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণনাট্য আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল।

বাংলা শিল্প-সাহিত্যে প্রতিবাদের গতিমুখ বিবর্তনে গণনাট্য আন্দোলন এক অন্যতর মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাংলা মঞ্চে 'লেবরেটরী', 'আগুন', 'হোমিওপ্যাথি', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' অভিনয়ের পাশাপাশি 'মধুবংশীর গলি' ও 'নবজীবনের গান' এর আবৃত্তি আজ ইতিহাস হয়ে আছে। পরে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা 'অন্তরাল', 'দীপশিখা', 'তরঙ্গ,' 'বাস্তুভিটা', 'পূর্ণগ্রাস', 'গোল টেবিল' ইত্যাদি নাটকে প্রতিবাদী কণ্ঠের সুরমূর্চ্ছনায় বাঙালি একাত্ম হয়ে পড়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৯৪৮ এর ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হল, ফলে গণনাট্য সংঘে অনিবার্যভাবে ভাঙন ধরে। কিন্তু প্রতিবাদী নাটক ও নাট্যাভিনয় হিসেবে গণনাট্যের অবদান যে রচনাগুলির মধ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে 'অহল্যা উদ্ধার', 'আবাদ', 'ভূয়া স্বাধীনতা', 'দলিল', 'পথিক', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', নয়ানপুর', 'শুকসারী', 'মৃত্যু নাই', 'যুদ্ধ চাইনা', 'ঢেউ', 'বাস্তুভিটা, 'ছেঁড়াতার', 'উলুখাগড়া' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন ভারতে বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদের বিবর্তনে যুক্ত হয়েছে দুটি ধারা, 'নারীবাদ' ও 'দলিত চেতনা'। 'নারীবাদ' যদিও নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মার্কিন শ্বেতাঙ্গ নারীবাদ কি অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিন নারী, অ্যাফ্রো-আমেরিকান নারী বা ভারতের গরিব, আদিবাসী নারীর মুক্তির কথা বলে? অথবা আমাদের দেশের স্বচ্ছল নারীবাদীরা কি অন্ত্যজ নারীমুক্তির কথা ভাবেন? ইত্যাদি প্রশ্নে নারীবাদ প্রসঙ্গ আজও সমান উত্তাল। আমাদের বাংলায় "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার?" এই প্রশ্নাকুল প্রতিবাদ মনে রেখেও অনেকের মনে হয় যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত নারী প্রথম লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী'তে। তবে এই সব রচনায় নারী কখনোই সেই অর্থে সমানাধিকারের দাবিতে প্রতিবাদী নয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের 'কাদম্বিনী' উল্লেখ্য। বিধবার অস্তিত্ব সংকটে মৃত্যুই শেষ ঠিকানা তার। একমাত্র 'স্ত্রী-র পত্র' এর মৃণাল যথার্থ প্রতিবাদী রূপে নারীদের অবহেলার গভীরতা উপলব্ধি করে এবং বিনা দ্বিধায় স্বামী ও গৃহ দুই-ই ত্যাগ করে।

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদের ধারাপথে যুক্ত 'নারীবাদ' সম্পর্কিত আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায় যদি আমরা বেগম রোকেয়া-র কথা না উল্লেখ করি। ১৯০৫-এ বেগম রোকেয়ার রচনা 'সুলতানাস ড্রিম' আজ্য প্রথম ফেমিনিস্ট ইউরোপীয়ান উপন্যাস হিসেবে গৃহীত। এছাড়াও আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা' উল্লেখ্য নারীবাদী রচনা হিসেবে বাংলা প্রতিবাদী সাহিত্যের অনিবার্য অংশ হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

নারীবাদের অন্যদিক অর্থাৎ নারীর অধিকার বিচ্যুতির মাত্রা যে রাজনীতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ সাপেক্ষে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আমরা দেখেছি মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা', 'দ্রোপদী', 'স্তন্যদায়িনী' ইত্যাদি রচনায়। নারীবাদী হিসাবে তসলিমা নাসরিন তাঁর 'নির্বাচিত কলাম' ও অন্যান্য রচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের পীড়নকে তুলে ধরে নারীর প্রতি অন্যায় কর্মের কৈফিয়ৎ চেয়ে প্রতিবাদী হয়েছেন। এছাড়াও বেগম সুফিয়া কামাল, রাবেয়া খাতুন, দেবারতি মিত্র, জয়া মিত্র, মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখরা নারীবাদী রচনার মধ্য দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। এঁরা সকলেই আজও বাংলা সাহিত্যে নারীকণ্ঠের প্রতিবাদ রচনায় অক্লান্ত,—আপোষহীন।

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদের ইতিবৃত্তে যুক্ত হয়েছে 'দলিত চেতনা'। 'দলিত চেতনা'কে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে দলিত সাহিত্য। 'নারীবাদ' এর মতই 'দলিত সাহিত্য' নিয়েও বিবিধ প্রশ্ন উঠেছে ঃ দলিত সাহিত্য কী সাহিত্যের স্বতন্ত্র একটি ধারা? যদি তাই হয়, তবে তার ভিত্তি কী? এই দলিত সাহিত্যের ইতিহাস কী? ভূগোল-ই বা কী? চারিত্র্যলক্ষণ কী? ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পূর্বে আমরা স্মরণ করব দলিতদের লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জীবনের ইতিহাস ও সংগ্রামী আত্মপরিচয়ের বিবর্তিত রূপ। 'দলিত সাহিত্য' হিসাবে আমাদের কাছে যা

পরিচিত, তার পটভূমিতে আছে এক বৃহৎ আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ আম্বেদকর। ডঃ আম্বেদকরের হাতে গড়া মিলিন্দ কলেজের প্রথম স্নাতক দল প্রতিষ্ঠা করেন 'সিদ্ধার্থ সাহিত্য সংঘ'। পরে এই সংঘের নাম হয় 'দলিত সাহিত্য সংঘ'। এর পরই জাতিগত বিদ্বেষে দলিত শ্রেণির ওপর যে নিপীড়ন তার প্রতিবাদে একের পর এক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'সত্য কথা', 'অস্মিতাদর্শ', 'আমহি', 'মাগোভা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৫-এ দলিত সাহিত্য সম্মেলনে বলা হল যে নিছক দলিতের জীবনযন্ত্রণার ছবি আঁকা দলিত সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী সত্তার অংশরূপে দলিত সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে আশির দশক থেকে এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে। যে সমস্ত বাংলা পত্র-পত্রিকা দলিত সাহিত্য চর্চায় গুরুত্ব পেল, তার মধ্যে 'দলিত কণ্ঠ' (নকুল মল্লিক), 'চতুর্থ দুনিয়া' (মনোহর বিশ্বাস), 'আজকের একলব্য' (বসন্ত মণ্ডল ও রণেন্দ্রলাল বিশ্বাস), 'বহু জনদর্পণ' (প্রদীপ রায়), 'পাললিক শিলা' (অরুণ মাঝি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত দুটি বাংলা পত্রিকা উল্লেখ্য ঃ 'মানবতাবাদ' (জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার) ও 'দলিত সংগ্রাম' (জীবন দাস ও হরিচরণ দাস)। ত্রিপুরা কমিউনিস্ট নেতা ও মন্ত্রী অনিল সরকারের 'ব্রাত্যজনের কবিতা', 'অরণ্যের ধ্বনি', 'প্রিজন ভ্যান' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে দলিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। বাংলা ভাষার অন্যান্য কবি যাঁরা দলিত কাব্য রচনায় প্রতিবাদী সত্তা তুলে ধরেছেন তাঁদের মধ্যে নিখিলেশ রায়, সাধন নস্কর, শ্যামল প্রামাণিক, রামচন্দ্র ধাড়া, ব্রজেন মল্লিক, কল্যাণী ঠাকুর, মঞ্জুবালা প্রমুখরা উল্লেখ্য। বাংলা দলিত কাব্য ধারায় মনোহর বিশ্বাসের 'তাদের কান্না ও তিতিক্ষা' ও 'বিবিক্ত উঠোনঘর', এবং অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ' ও 'চারুবাউরির গান' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দলিত গদ্যকারদের মধ্যে রণজিৎ শিকদার অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তাঁর দুটি গ্রন্থের উল্লেখ অনিবার্য : 'জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি' ও 'ব্রাহ্মণ্যবাদ'। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্ত্যজ বাংলার নবজাগরণ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কথাসাহিত্যে নকুল মল্লিকের 'মহাসিন্ধু', গৌতম আলি-র 'জতুগৃহের ছাই', মনোহর বিশ্বাসের 'কৃষ্ণ মৃত্তিকার মানুষ'। শ্যামল প্রামাণিকের 'খিলিপানের মেয়ে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদী রচনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন যে দলিত সাহিত্য ততটা গুণান্বিত নয়। এ ব্যাপারে এখনো শেষ কথা বলার সময় আসেনি বলে মনে হয়। আমরা শুধু এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের কথা—

"কোন এক যুগে কোন একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন ক'রে নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা বাঁধনটাতে দাও মন
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলোনা।
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিও না কাদা করে।

আজকের মতো বলো সবাই মিলে—যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক
বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

আলোচনার শেষে একথাই বলব 'বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদ : বিবর্তনের গতিমুখ' শীর্ষক আমার এই বিষয়টির ইতিহাস ও ভূগোল এতই ব্যাপ্ত ও জটিল যে স্বল্পপরিসরে তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা অসম্ভব। প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করব যে আমাদের জীবনচর্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতি বাংলা সাহিত্য প্রায় নীরব দর্শক হয়ে আছে;—আমার প্রতিবাদ থাকছে এখানে। সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল শিশু-কিশোর শ্রম ও শোষণ এবং শিশু-কিশোরদের জীবন-যাপন। দারিদ্র্যের কারণে শিশুশ্রমের পরিচিতি শোষণ চিত্র তেমনভাবে বাংলাসাহিত্যে প্রতিবাদী চেহারায় হাজির হয়নি। অধিকন্তু অধুনা কিশোর-কিশোরীরা যে অসুস্থ-অসম প্রতিযোগিতায়, ভোগবাদ সর্বস্ব লড়াইয়ের আকর্ষণে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণে-অকারণে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, অপরাধপ্রবণ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে, বাবা মায়ের সীমাহীন চাহিদার যাঁতাকলে তিলে তিলে মরে যাচ্ছে তারা—এর জন্য বাংলাসাহিত্যে প্রতিবাদী কণ্ঠ তেমনভাবে শোনা যাচ্ছে না। আজ আমার আলোচনার যে শীর্ষক তা সর্বব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনায় ভবিষ্যতে অন্য কোথাও অন্য কারোর দ্বারা যথার্থ পূর্ণতা পাবে এই প্রত্যাশা রাখি।

Arindam Chattopadhyay, Department of Bengali, Burdwan University, Burdwan
buarin1@yahoo.com.